বাঙালির আশা বাঙালির ভাষা
প্রথম সরকারি আঘাত ও প্রতিরোধ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বাঙলা ভাষার ওপর আঘাতের কথা উঠলেই প্রথমে মনে আসে দেশভাগের (১৯৪৭) পর তখন কার পূর্ব - পাকিস্তানের কথা। ১৯৪৮-এ ও আরও বড় আকারে ১৯৫২-য় বাঙালির ওপর উর্দু চাপানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান সরকার। প্রতিরোধে গড়ে উঠেছিল বিরাট আন্দোলন।

বাঙলা ভাষার বিদ্ধে এ ধরণের চত্রান্ত কিন্তু সেই প্রথম হয় নি। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের (১৯০৩-০৪) সময়েই এই চত্রান্তের শু। বাঙলার সঙ্গে বাঙলা ভাষাকেও ভাঙার এক চতুর চেষ্টা করেছিল তখনকার বাঙলা সরকার।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিদ্ধে আস্তে আস্তে জনমত গড়ে উঠছে শহরে - গ্রামে। এই সময়ে সরকারের একটি কমিটি সুপারিশ করল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত লিখিত বাঙলার বদলে বিভিন্ন স্থানীয় উপভাষা ব্যবহার করা হোক। এই কমিটিতে ছিলেন চারজন ইংরেজ আর একজন বাঙালি সিভিলিয়ান, কে. জি. (কৃষ্ণগোবিন্দ) গুপ্ত। কমিটির যুক্তি ছিল বাঙলা পাঠ্যপুস্তকের ভাষায় সংস্কৃত-র ভাগ বেশি। চাষির ছেলেদের তা বুঝতে অসুবিধে হয়। এখন থেকে একটি আদর্শ পাঠ্যপুস্তক সমিতি তৈরি করা হবে। বই লেখা হলে প্রথমে ইংরিজিতে। সরকার তা অনুমোদন করবে। তারপর কমিশনার ও স্কুল পরিদর্শকদের সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষা - অধিকর্তা সেগুলি স্থানীয় ভাষায় (local vernaculars) তর্জমার ব্যবস্থা (১১ মার্চ ১৯০৪) করবে।

এখানে vernaculars শব্দটি লক্ষ্য করার মতো। প্রচলিত লিখিত বাঙলাকে ঐ কমিটি মানতে চায় নি। তাই চারটি উপভাষার--- উত্তর, পূর্ব, মধ্য, ও পশ্চিম--- তর্জমার কথা ভাবা হয়েছিল। শিক্ষা বিষয়ে সুপারিশটি ৬৫৮ নং সরকারি প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত হয়। এই খবর বেরনো মাত্র বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় প্রবল আপত্তি ওঠে। দ. বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদকীয় -য় (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫) বলা হয়, এটি আর এক রূপে বঙ্গভঙ্গের উদ্যোগ (The Partition movement in another form)। সময়টা খেয়াল করার মতো। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র তখন বঙ্গভঙ্গর পরিকল্পনা প্রায় পাকা করে ফেলেছে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বাঙলা ভাষাকে এইভাবে ভাগের চেষ্টা তারই অঙ্গ--এমন ভাবাটা অসঙ্গত নয়। বঙ্গভঙ্গর পক্ষে সরকারি যুক্তি ছিল এত বড় প্রদেশ চালানো, অসুবিধে, ভেঙে ফেললে প্রশাসনের কাজে সুরাহা হয়। কিন্তু এ তো বাইরের কথা। মনের কথা ছিল এই যে, বাঙালিরা নিজেদের একটা জাতি বলে ভাবতে শিখছে, স্বপ্ন দেখছে ভবিষ্যতেইংরেজদের তাড়িয়ে ক্ষমতায় বসার। সুতরাং এখনই তাদের একতা ভেঙে দেওয়া দরকার। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়ারপথে, ট্রেনে বসে, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ -এ ব্রডরিক - কে এই কথাই লিখেছিলেন কার্জন।২ বাঙলা ভাষাকে ভাঙাও ছিল সেই চত্রান্তেরই অংশ।

দুঃখের বিষয়, স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিকরা প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে এ প্রস্তাবটিকে কোনো গুত্বই দেন নি। সুমিত সরকার তাঁর বই-এর শেষে যে কালানুত্রমিক ঘটনা - সারণি দিয়েছেন তাতে মার্চ ১৯০৪ -এ ৰিবিদ্যালয় আইনের কথা আছে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ভাষানীতি নিয়ে এই প্রস্তাবটির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। অথচ পত্র - পত্রিকায় তখন এই নিয়ে লেখালেখি হয়েছিল বিস্তর।৩ বঙ্গীয় - সাহিত্য - পরিষদের মতো সংস্থা -- রাজনীতির সঙ্গে যার যোগ থাকার কথা নয়--- সেটিও এতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তার তরফ থেকেও ঐ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্যে একটি কমিটি তৈরি করা হয়। তাতে ছিলেন গুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও আরও চারজন। পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বলেন, এ বিষয়ে সাধারণের মতামত সংগ্রহ ও কর্ত্তব্য নির্ধারণের জন্য... কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ও প্রধান প্রধান সভার সম্পাদক ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে একটি পরামর্শ সভায় ডাকা হোক (২১ ফাল্গুন, ১৬১১ ব., ৫ মার্চ ১৯০৫)। সেই সঙ্গে এও ঠিক হয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কোন প্রকাশ্য স্থলে সাধারণকে আহ্বান করিয়া এতৎসম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠের জন্য আহ্বান করা হইবে। সে - অনুযায়ী ১১ মার্চ ১৯০৫ - জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন (এখনকার স্কটিশ চার্চ কলেজ) হল্ -এ রবীন্দ্রনাথ পড়ে শোনালেন সফলতার সদুপায়। সভাপতি ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।৪

রবীন্দ্রনাথের যুক্তি ছিল এইরকম

কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, আমরা নিতান্তই চাষীদের উপকার করিতে চাই। হয়তো চান, কিন্তু কমিটিও যে বিশুদ্ধভাবে সে উদ্দেশ্যস াধনের প্রতিই লক্ষ রাখিয়াছেন সে কথাটা বিশ্বাস করা সহজ হইত যদি দেখিতাম কর্তৃপক্ষের স্বদেশেও তাঁহাদের স্বজাতীয় চাষীদের এই প্রণালীতে উপকার করা হইয়া থাকে।

ইংরেজের দেশেও চাষা যথেষ্ট আছে এবং সেখানে যে ভাষায় পাঠ্যগ্রন্থ লেখা হয় তাহাসকল চাষার মধ্যে প্রচলিত নহে। ল্যাঙ্কা শিয়রের উপভাষায় ল্যাঙ্কশিয়রের চাষীদের উপকারের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন হইতেছে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইংল্যাণ্ডে চ াষীদের শিক্ষা সুগম করা যদিও নিশ্চয়ইmatter of great importance, তথাপি ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র ইংরেজিভাষার ঐক্যরক্ষা কর া matter of greater importance। কিন্তু সে দেশে চাষীদের উপকার ও ভাষার অখণ্ডতা রক্ষা উভয়ই এক স্বার্থের অন্তর্গত, এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষভেদ নাই--- সুতরাং সেখানে ভাষাকে চারটুকরা করিয়া চাষীদের কিঞ্চিৎ ক্লেশলাঘব করার কল্পনামাত্রও কোনো পাঁচজন বুদ্ধিমানের একত্র সম্মিলিত মাথার মধ্যে উদয় হইতেই পানে না।৫

বাঙলায় সংস্কৃত-র ভাগ বেশি--- এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আমাদের দেশে প্রাচীন ভাষার সহিত আধুনিক প্রাকৃত ভাষাগুলির... অ াকস্মিক সম্বন্ধ নহে, বরাবর সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার নাড়ীর যোগ রহিয়া গেছে।

ভাণ্ডার পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই (বৈশাখ, ১৩১২) প্রাইমারী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, চাষার সদ্‌বুদ্ধি চাষাকে এবং দেশকে শিক্ষা কমিটির গুপ্তবাণ হইতে রক্ষা করিবে। (গুপ্তবাণ শব্দটির মধ্যে চমৎকার শ্লেষ আছে)।৬

ঐ বছর (১৯৫০) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন হওয়ার কথা ছিল মৈমনসিংহে ভাষাভাগের প্রতিবাদে তার খসড়া প্রস্তাবটি আগেই প্রচ ার করা হয়েছিল (প্রস্তাব নং ২)। অমৃতবাজার পত্রিকা-র সেটি ছাপা হয় (৬ মার্চ ১৯০৫)। দ বেঙ্গলী পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে এ বিষয়ে কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত সম্পর্কে কিছু কটাক্ষও করা হয়েছিল (৯ এপ্রিল ১৯০৫)।

প্রাদেশিক সম্মিলনের আগে বহু গ্রাম ও শহরতলিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করার সময়ে বঙ্গভঙ্গ ও বাঙলা ভাষাভাগ দুটি ব্যাপারেই অ াপত্তি জানানো হয়। যেমন, ভৈরব (মৈমনসিংহ) গ্রামের কয়েকটি পাঠশালায় গুমশায়েরাস্থানীয় এম. জি. স্কুলে মিলিত হয়ে ভাষ ানীতির বিদ্ধে তাঁদের মত জানান। ভাতাইল ও তার ধারেকাছের গ্রামবাসীদের একটি সভায় ভাষাভাগ ও প্রস্তাবিত জুট বিল - এর বিষয়ে প্রতিবাদ ওঠে। বিভিন্ন জেলার অন্তত ৩১টি সভায় সরকারের প্রাথমিক শিক্ষানীতির বিরোধিতা করা হয়। কোথাও এটিকে বলা হয়েছিল বাঙলা ভাষার অঙ্গহানি (dismemberment) বা ভাগাভাগি (division), কেউ একে বলেছিলেন নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ভাষাগত উদ্ভাবনা (linguistic innovation), কোথাও বা একযোগে বাঙলা ও বাঙলা ভাষা ভাগ (break up/division of Bengal and the Bengali language), কেউ বা বলেছিলেন প্রাদেশিক উপভাষার (provincial patios) প্রবর্তন। অতি উৎসাহে, মুক্তগাছার (ও রামগোপালপুরের) প্রস্তাবে ভাঙলা ভাষাকে অসংখ্য স্থানীয় উপভাষার ভেঙে ফেলার বিদ্ধে সসম্মানে প্রতিবাদ জানানো হয় (সরকারি প্রস্তাবে অবশ্য মাত্র চারটি উপভাষার কথা ছিল)।

এইসব সভায় উকিল, শিক্ষক ইত্যাদি ছাড়াও হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে কিছু জমিদার, তালুকদার ও চাষিও উপস্থিত থাকতেন, ক ারণ বঙ্গভঙ্গ ও ভাষাভঙ্গর মতো জুট বিল্‌ও ছিল এক বড় সমস্যা।৭

অসুস্থ থাকার দন মৈমনসিংহ সম্মিলনে (২২ - ২৩ এপ্রিল ১৯০৫) রবীন্দ্রনাথ যেতে পারেন নি। গেলে হয়তো তাঁর ওপরেই ভাষা নিয়ে প্রস্তাব তোলার দায়িত্ব পড়ত। মজার ব্যাপার হলো, সম্মিলনে প্রস্তাবটি রাখলেন একজন সাহবে, রেভারেন্ড এম. এ. নেভিল। রবীন্দ্রনাথ যে - যুক্তি দিয়েছিলেন, তাঁরও বক্তব্য ছিল তা-ই। তিনি বলেন, ইংল্যান্ডের অনেক শিয়ার -এ তিনি ঘুরেছেন। গ্রামের লে াকের কথা বুঝতে আর নিজের কথা তাঁদের বোঝাতে তাঁর্য একই ধরণের অসুবিধা হয়েছিল--- ইংরিজির প্রাদেশিক উপভাষ াগুলির বৈচিত্র্য এমনই। তবু লিখিত ভাষা সর্বত্রই এক। ইংল্যান্ডে কখনও এমন পরিকল্পনা করা হয় নি যে, গ্রামের বিদ্যালয়ে প্র াদেশিক উপভাষায় লেখাপড়া শেখানো হবে। রেভারেন্ড নেভিল বলেন, ভাষাকে ভাগ করলে শুধু তার প্রগতিই ব্যাহত হবে না, তার অন্তিম ধবংসসাধন করা হবে।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ দেন বিপিনচন্দ্র পাল, রামনারায়ণ অগস্তি, উপেন্দ্রনাথ সেন ও অন্যান্য প্রতিনিধি। মনে রাখা উচিত, শুধু বাঙলা নয়, হিন্দীর ক্ষেত্রেও ঐ সরকারি কমিটি তিনটি উপভাষার--- ত্রিহুতি, ভোজপুরি ও মৈথিলি--- বই লেখানোর সুপারিশ করেছিলেন। (ওড়িয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরণের কোনো সুপারিশ হয় নি, যদ্যি তখনকার বাঙলা সরকারের অধীনে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, বিহার ও ওড়িশা এই চারটি জায়গাই ছিল)। মৈমনসিংহ সম্মিলন চলাকালীন পূর্ণিয়ার রাজা কমল্লেরপ্রসাদ সিং টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে জানান, বাঙলার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ভাষাকে ভাঙার বিষয়টিও যেন প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্মিলন সে - অনুরোধ রাখে।

১৮৯৭ -এ রাজশাহী সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় চাঁইদেরও বাঙলায় বলতে বাধ্য করা হয়। পরের বছর ঢাকা সম্মিলনেও একইভাবে উদ্যোগ নিতে হয়েছিল। কিন্তু প্রাদেশিক সম্মিলনে বাঙলার ব্যবহার তারপরেও ছিল নেহাতই সীমিত। (দ ইন্ডিয়ান মিরর (১৮ এপ্রিল ১৯০৫) -এ অবশ্য সভার কাজ বাঙলাতেই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, তাতে প্রাদেশিক সম্মিলন আরও জনপ্রিয়

হবে)। মৈমনসিংহ সম্মিলনেও ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাঁর অভিভাষণ দিয়েছিলেন ইংরিজিতে, কিন্তু তাঁর সমাপ্তি - ভাষণ ছিল বাঙলায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কুমার উপেন্দ্রকিশোর চৌধুরীও বাঙলাতেই বক্তৃতা দেন।

এই সম্মিলনে দু হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি হাজির হন। তার মধ্যে ১৮০০ জন এসেছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকে। তাঁদের বেশির ভাগই চাষি। মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যাও ছিল বেশ বড়। বক্তাদের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানই ছিলেন বেশি। জুট বিলএর আলোচনায় যোগ দেন চারজন মুসলমান কৃষক। সরল ভাষার তাঁদের বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা বেশ অবাক হয়ে যান। বরিশালের প্রতিনিধি সুরেন্দ্রনাথ সেনের বাঙলা বক্তৃতাও অমৃতবাজার পত্রিকা-র খুব পছন্দ হয়। তার একটি সম্পাদকীয় টীকা (২৮ এপ্রিল ১৯০৫) চোখে পড়ার মতো আমাদের যে সুপরিচিত বক্তারা ইংরিজিতে ভাষণ দেন তাঁদের কারও কারও চেয়ে কোনোভাবেই কম নয়। দ বেঙ্গলী পত্রিকাতেও এ বিষয়ে আমাদের ভাষার সুখ্যাতি করা হয় (২৭ এপ্রি ১৯০৫)।

হয়তো জেলার প্রতিনিধিরা অত বেশি ছিলেন বলেই ইংরিজির পাশাপাশি সম্মিলনের কাজ বাঙলায় হতে পেরেছিল। সম্মিলনের প্রচারপুস্তিকাও লেখা হয়েছিল সহজ বাঙলায় (মৈমনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় নয়)। গ্রামে গ্রামে ভাট ও কবিওয়ালা পাঠিয়ে সম্মিলনের কথা লোককে জানানো হয়। (স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও এই মাধ্যমগুলি ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল)।

তখনকার প্রথামতো রাজসম্রাটকে 'থ্রি চিয়ার্স' জানিয়ে সম্মিলনের কাজ শেষ হয়। নইলে রাজভক্ত জমিদারকুল ও নরমপন্থী নেতাদের দুঃখ দেওয়া হতো।

সব মিলিয়ে দেখলে, মৈমনসিংহ সম্মিলন বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিকরা কিন্তু এর কথা একেবারেই বলেন নি। তার জন্যই এত বিস্তৃতভাবে সে - নিয়ে আলোচনা করতে হলো। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ঐ সম্মিলনে বঙ্গভঙ্গর বিদ্ধে প্রস্তাবটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। বিনা বক্তৃতায় সেটি উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। বোধহয় নরমপন্থী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সঙঘাত এড়ানোর জন্যেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু ভাষাচ্ছেদের প্রস্তাব নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলে।

এত প্রতিবাদের মুখে পড়ে বাঙলা সরকার তার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদের কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত স্বীকার করেছিলেন, কমিটি হয়তো ভুল করেছে, কিন্তু চাষির ছেলেদের শিক্ষার পথে বাধাগুলোসরানোই ছিল তার উদ্দেশ্য।

আর একটি ব্যাপার বলেই এই আলোচনা শেষ করব।

যে কোনো দেশেই ভাষা ও সাহিত্য এক ধরণের জনগণ - ঐক্য - বিধায়ক ভূমিকা নেয়। বিশেষ করে, সাম্রাজ্যবাদের অধীনে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলায় তার ভূমিকা অন্যত্রও দেখা গেছে। আয়ারল্যান্ডে কেল্‌টিক পুনর্জ্জীবন -এর কথা সকলেই জানেন। এমনকি স্কটল্যান্ড-ইংল্যান্ড সংযুক্তির (১৭০৭) পরেও স্কটিশ চেতনাকে লালন করেছে তার ভাষা ও সাহিত্য। পত্র - পত্রিকায়, মঞ্চে, রাজনীতিতে স্কটিশ ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার অবিরাম চেষ্টা করে গেছে স্কটিশ জাতীয়তাবাদী দল (যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কবি হিউ ম্যাকডায়ারমিড)। তেমনি আবার আঞ্চলিক ভাষাকে দাবিয়ে রাখার বিদ্ধেও এ ধরণের আন্দোলন হতে পারে। সবটাই নির্ভর করে প্রতিপক্ষ কী চাল দিচ্ছে তার উপর।

বাঙলায় সাম্রাজ্যবাদের চালটা ছিল এরকম লিখিত ভাষার রূপটা যেন গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিখতে না পারে। বাঙলায় লিখিত ভাষায় চেহারা--- প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই হোক আর সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রেই হোক--- একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছিল। বিদেশী পাদ্রিরা বাঙলা গদ্যর স্রষ্টা -- এই কুসংস্কারটা যদিও ছাড়া যায় তবে দেখা যাবে আঠেরো শতকের চিঠিপত্র ও দলিল - দস্তাবেজ, জ্যোতিষ, নব্যন্যায়, বৈদ্যকশাস্ত্র পড়ানোর জন্য লেখা পুঁথিতে যে - গদ্যর নমুনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে পনেরো শতকের পরে লেখা রামায়ণ - মহাভারত - মঙ্গলকাব্য - চৈতন্যচরিতকথা ইত্যাদির ভাষার গড়নের মূলে কোনো তফাত নেই। স্থানীয় শব্দ নিশ্চয়ই কিছু থাকে, জমি - জমা সংক্রান্তকাগজে আরবি - ফারসি শব্দই বেশি, ভাষা ও পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্রে তৎসম শব্দই প্রধান। কিন্তু ক্রিয়াপদের রূপ, সর্বনাম ও অনুসর্গের ক্ষেত্রে গদ্য - পদ্য - নির্বিশেষে সব অঞ্চলের লেখকেরই লিখিত বাঙলা ছিল এক। তাই শুদ্ধুকাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর (অন্নদামঙ্গল) সম্বল করে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড তাঁর বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ (১৭৭৮) খাড়া করতে পেরেছিলেন। গদ্যর ক্ষেত্রেও তার সূত্রগুলি ছিল সমানপ্রযোজ্য। সেই লিখিত বাঙলার ছাঁদেই বাঙলার সব প্রান্তের মানুষ চিঠিপত্র, দলিল ইত্যাদি লিখতেন, কবিতাও রচনাকরতেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী (বর্ধমান) ও বিজয় গুপ্ত (বরিশাল) একই ধারার অনুসারী। সেই ভাষাই ছিল ভারতচন্দ্রের আদর্শ। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সেই রীতি মেনেই গদ্যরচনা করেছিলেন। হুতোম বাদে বাঙলার প্রায় সবলেখকই-- যিনি যে অঞ্চলেরই বাসিন্দা হোন--- একই ধরণের ক্রিয়াপদ, সর্বনাম, অনুসর্গ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন।তথাকথিত সাধুভাষার গদ্য ব্যাকরণের বিচারে পদ্যরীতি থেকে আলাদা নয়। (কোনো একক কালে এ ভাষা পশ্চিম বাপূর্ববঙ্গেরকোনো বিশেষ অঞ্চলের কথ্যভাষা ছিল কিনা তা এখনও নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না)।

এখানে অবশ্য আমরা ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে যেতে চাই না। শুধু একটি ঘটনা লক্ষ্য করতে বলি। ছাপাখানাচালু হওয়ার পর উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে একটা ঘটনা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা সর্বত্রইলিখিত গদ্যর রূপটা এক. যদিও কলকাতার লোক চট্টগ্রামের কথ্য ভাষা শুনে কিছুই বুঝতে পারতেন না। এমনকি এক জেলার লোক অন্য জেলার কথ্য ভাষা শুনলে সবটা

বুঝতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এর মধ্যেই লিখিত বাঙলা একটি মান্য (standard) রূপ পেয়ে গিয়েছিল। সে ভাষা তখন আর কোনো বিশেষ অঞ্চলের কথ্য ভাষা নয়, কিন্তু সব অঞ্চলের বোধ্য। এর কোনো একজন জনক সন্ধানের চেষ্টা অর্থহীন।

কথাটা শুধু ভাষাতত্ত্বর নয়। নানা নৃকুল (ethnic groups), উপভাষা, ধর্ম, একই ধর্মের মধ্যে উপাসক - সম্প্রদায়ের ভেদ--- এই সব কিছুকে ছাপিয়ে একতার বোধ আনতে পারত লিখিত বাঙলার রূপ। ভূদেবচন্দ্র, মীর মশারফ হোসেন, মোহম্মদ নজীবর রহমান সাহিত্যরত্ন -- সকলেই এক ভাষারীতি রপ্ত করেছিলেন। তার এই ঐতিহাসিক ভূমিকাটি কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আর ব াঙলা ভাষার ওপর প্রথম পরিকল্পিত আঘাতের ঘটনাটিও একইভাবে মনে রাখা উচিত।

বিষয়টি নিয়ে আরও বিশদ গবেষণার সুযোগ আছে। ছাপা বই -এ যা পাওয়া যায় শুধু তার ভিত্তিতেই মূলঘটনাটি এখানে হাজির করা হলো। সমসাময়িক ইংরিজি ও বাঙলা পত্র-পত্রিকা, আইন পরিষদের কার্যবিবরণ, সরকারি দলিলপত্র ঘেঁটে সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষা - ও - ভাষা - নীতি বিষয়ে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান চালানো দরকার।

টীকা

১. প্রশান্তকুমার পাল, খণ্ড ৫, পৃ. ২১৯

২. “The Bengalis, who like to think themselves a nation. And who dream of future when the English will have been turned out, and a Bengali Babu will be installed in Government House, Calcutta…” সুমিত সরক ার, পৃ. ১৯-এ উদ্ধৃত।

৩. সন্ধ্যা (১৭ /০২ /১৯০৫)-য় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখেছিলেন (বাঙলা পত্রিকার কপি না পাওয়ায় ইংরিজি তর্জমাই উদ্ধৃত করছি) “The new Bengali Text – books supply another source of fun. They will be prepared in Engliand to make sure of their orthodoxy. Next they will be translated into Tirhutia. Bhoipuri. Rarhi. Purabi… Divide and rule. A man must be cracked to get Bengali text – books compiled in England.” (অণিমানন্দ, পৃ. ১৩৩ এ উদ্ধৃত)।

৪. টী. ১, পৃ - ২২০।

৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৬, পৃ. ১১৯৩-৯৪। বক্তৃতাটি প্রথম বেরিয়েছিল বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১১ -য়। পরে আত্মশক্তি (১৩১২) সঙ্কলনে তার স্থানে স্থানে বাদ পড়ে, কারণ বিল্-টি তার আগেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। এখানে বর্জিত অংশের পাঠ থেকেই উদ্ধৃত করা হলো।

৬. চী. ১, পৃ. ২৩৮-এ উদ্ধৃত।

৭. এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যই যতীন্দ্রকুমার ঘোষ - সঙ্কলিত বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে। সুমিত সরকারের কালানুক্রমিক ঘটনা - স ারণি - তে মৈমনসিংহ সম্মিলন -এর কোনো উল্লেখ নেই, জুট বিল্-এর কথাও আসে নি।